'তমস', 'দো গজ জমিন' ও 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'ঃ একটি পর্যালোচনা

প্রসূন ঘোষ

বাংলা সাহিত্যে চল্লিশের দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ পরবর্তীকালের অনেক লেখকেরই গুরুস্থানীয়, তিনি দাঙ্গা-দেশভাগ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হয়েও সে বিষয় উপজীব্য করে উপন্যাস লিখতে চাননি। তাঁর নিজের কথায়—"সাম্প্রদায়িক হানাহানি দেশের জীবনের অনেক বেদনা ও বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এ বিষয়ে আমার চোখে দেখা অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট আছে। নোয়াখালির ভয়ানক স্মৃতি আমার কাছে আজও একটা দুঃসহ বেদনা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাকে পটভূমি করলে দাঙ্গার নিদারুণ বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতার বাস্তব চিত্রটিও আঁকতে হয়। কিন্তু সেটা করলে ফল খুব খারাপ হতে পারে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এখনও আমাদের জনজীবনে একটা সমস্যা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিষ্ঠুর ও বীভৎস বাস্তবতার বর্ণনা বর্তমান অবস্থায় সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে; বিদ্বেষকামীর মনে প্ররোচনা হয়ে উঠতে পারে। সেইজন্যেই লিখিনি।"[১] একালেও উর্বশী বুটালিয়া তাঁর 'দ্য আদার সাইড অফ সাইলেন্স' গ্রন্থ লিখতে গিয়ে উদ্বাস্তু নারীদের স্মৃতিকথা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও বারংবার শঙ্কিত হন। তাঁর মনে হয় তিনি কি প্রকারান্তরে বিভেদকামী কিছু মানুষের হাতে ইন্ধন তুলে দিচ্ছেন! আসলে, স্বাধীনতা-পরবর্তীকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশভাগ ও তার প্রতিক্রিয়া উপমহাদেশে সমমাত্রায় বহমান। ভারতবর্ষের বাংলা-বিহার- পাঞ্জাবে দাঙ্গা হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান-শিখ পরস্পরকে হত্যা করেছে, তাদের প্রতিস্পর্ধী সমগ্র গোষ্ঠী আক্রান্ত হয়েছে আর সে দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। দাঙ্গা-দেশভাগ-উদ্বাস্তু আগমন ও তাদের জীবনসংগ্রাম—এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক- সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। বহু ধর্ম-জাতি ও বর্ণের দেশ ভারতবর্ষে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বাস করে আবার সময়ে-সময়ে ধর্ম-ভাষা কিংবা জাতিকে কেন্দ্র করে হানাহানিতেও লিপ্ত হয়। বাংলার কথাই ধরা যাক। এখানে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশীর মতোই বাস করেছে, কিন্তু ছেচল্লিশের রক্তাক্ত দিনগুলি সেই বিশ্বাসকে এক লহমায় বিনষ্ট করেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী বিজয়-পরবর্তীকালে শাসক মুসলমানরা ধর্মান্তরিতকরণ অবাধে চালিয়ে গেছিল, আবার ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের কারণে বিশেষত নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা এবং রাজপ্রসাদলাভের প্রত্যাশায় অনেকেই এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক ব্যাপক আলোড়ন দেখা যায়, তাঁর উদার দর্শনের প্রভাবে ও আনুষঙ্গিক কিছু কারণের ফলে দুই সম্প্রদায় পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়। উনিশ শতকে বাঙালিরা ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়, তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নতুন জিজ্ঞাসা প্রবিষ্ট হয়। নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানেরা মূলত অর্থনৈতিক কারণে আর উচ্চশ্রেণির মুসলমানেরা প্রধানত ধর্মীয় কারণে এর থেকে দূরে সরে থাকে। ফলত উনিশ

শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে শিক্ষিত বাঙালিরা ঔপনিবেশিক আধিপত্য সম্পর্কে যতটা সচেতন হয়েছিল এবং সেই আধিপত্যের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিল তাদের সহোদররা ততটা সজাগ হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না। চতুর শাসকেরা এই বিভেদ অবলম্বন করে তাদের আধিপত্যকে বজায় রাখতে চাইল ও কৌশলে এমন একের পর এক পদক্ষেপ নিল যাতে এই বিভেদ তো বজায় থাকেই, উপরন্তু তা যেন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ শাসকের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানেরা তার বিরোধিতা করলেও পরবর্তীকালে তারা শাসকদেরই সমর্থন জানায়। মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা এবং মর্লে মিন্টোর মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন—দুই সম্প্রদায়ের শাসকবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যেমন অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল, তেমনি খিলাফৎ আন্দোলন দুই সম্প্রদায়কে কিছুটা কাছাকাছিও নিয়ে এসেছিল। কিন্তু চতুর ইংরেজ শাসক ও কিছু ক্ষমতালোভী মানুষের কারণে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাজিত হয় আর তার প্রতিক্রিয়ায় আজও জর্জরিত ভারতীয় উপমহাদেশ।

দুই

হিন্দি ভাষার কথাসাহিত্যিক ভীষ্ম সাহানির 'তমস' উপন্যাসে স্বাধীনতা পর্বের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থাকে উপজীব্য করা হয়েছে। পাঞ্জাবে কেমন ক'রে পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গার সৃষ্টি করা হল, কেমন ক'রে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সহাবস্থান বিঘ্নিত হল তার অনবদ্য চিত্র উপস্থাপন করেছেন সাহানি। উচ্চশ্রেণির মুরাদ আলি গরিব নাথুর পকেটে পাঁচ টাকা গুঁজে দিয়ে একটি শুয়োর মারার নির্দেশ দেয়। গভীরভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ নাথু নিতান্ত বাধ্য হয়েই একটি শুয়োর মারে এবং নাথুর নির্দেশ মতো রাস্তার ধারে যথাস্থানে রেখে দেয়। পরের দিন সেই শুয়োরটিকেই মসজিদের সিঁড়ির সামনে পড়ে থাকতে দেখে মুসলমানেরা তীব্রভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পারস্পরিক মতান্তর সত্ত্বেও প্রভাতফেরী, নর্দমা পরিষ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে কংগ্রেস যখন হিন্দু ও মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করতে ও শাসকবিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে সচেষ্ট হচ্ছিল তখন এই ঘটনা মুসলমানদের তাদের প্রতি আরও বিরূপ করে তোলে। অন্যদিকে মুসলিম লিগ সদস্যরা অবিরত পাকিস্তানের স্লোগান দেয় এবং বক্সী-কাশ্মীরীলাল-আজিজ-মেহতাব প্রমুখ কংগ্রেসকর্মীদের তীব্র বিরোধিতা করে। আবার শিখ এবং হিন্দু সংগঠনগুলিও এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে পিছিয়ে থাকে না। শিখেরা গুরুদ্বারে এবং হিন্দুরা তাদের সমিতিতে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করে। প্রথমে শহরের গলিঘুঁজি-প্রান্তিক স্থান ও অন্ধকারে কখনো হিন্দু, কখনো মুসলমান সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষকে অন্য ধর্মের বর্বর ও সাম্প্রদায়িক মানুষ হত্যা করে। পরবর্তীকালে দেখা যায় এক একটি গোটা পাড়াকে অন্যগ্রামের লোকজন ঘিরে ধরে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। মানুষ নির্মমভাবে মানুষকে হত্যা করে, মেয়েরা প্রাণভয়ে ও ইজ্জতরক্ষার কারণে কুয়োতে ঝাঁপ দেয়, অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্মীরা শান্তির প্রচেষ্টা চালায়, যদিও তাতে আন্তরিকতা কতখানি তাতে সন্দেহ থেকেই যায়।

ভীষ্ম সাহানি তাঁর উপন্যাসে এই পর্বের সামাজিক ইতিহাসকেও উপস্থাপিত করেছেন। দেশভাগ কেন হয়েছিল—এ জিজ্ঞাসার উত্তর যেমন একটি ক্ষুদ্র পটভূমির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে পাওয়া যায়, তেমনি দাঙ্গা কেন হয়েছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে, কেমন ক'রে সে দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল, কীভাবে সে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল—সেই যথার্থ প্রতিবেদনও আমরা এ উপন্যাসে পাই।

প্রতিটি দাঙ্গার পিছনে থাকে স্বার্থান্বেষী মানুষের পরিকল্পিত ছক আর সে দাঙ্গা অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায়, তার সদর্থক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না চাওয়ার কারণে। 'তমস'-এ মুরাদ আলির মতো স্বার্থান্বেষী মানুষ এই দাঙ্গা বাধানোর জন্য নাথুর মতো দরিদ্র মানুষকে কাজে লাগিয়েছে। দেশ-ভাগের আগে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ পারস্পরিক স্নেহ-মমতার ভিত্তিতে সহাবস্থান করেছে, তাদের মধ্যে নিবিড় বন্ধনও গড়ে উঠেছে, কিন্তু দেশভাগ-সমকালে মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন একটি স্থানে থাকার পর মাতৃভূমিতে সে নিরাপত্তার অভাবে ভুগেছে, পলকে স্বভূমি হয়ে গেছে বিদেশ। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার দরিদ্র নিম্নবর্ণের হিন্দু কিংবা মুসলমানেরা যারা এতকাল অন্য ধর্মাবলম্বী অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী মানুষদের আপনজন ছিল তারা সব কিছু ভুলে দাঙ্গাবাজদের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আবার দেখা গেছে, সেই মানুষগুলি অন্তিমে পায়নি কিছুই, তারাই হয়েছে দাঙ্গার বলি। 'তমস' উপন্যাসে ভীষ্ম সাহানি চমৎকারভাবে নাথু চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। নাথু প্রথমে শুয়োর মারতে চায়নি। মৃত শুয়োর নিয়ে মুরাদ আলি কী করবে, সলেতরি সাহেবেরই বা দরকার কী—নাথু বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু নাথু জানে যদি সে মুরাদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তাহলে তারও প্রাণহানি ঘটতে পারে, আবার মুরাদ যখন কাজ করার আগেই অনেক বেশি পারশ্রমিক তার পকেটে গুঁজে দিয়েছে—তখন সেই নির্দেশ পালন না করে পারেনি। চমৎকার নৈপুণ্যের সঙ্গে 'তমস'-এর উপন্যাসকার নাথুর সঙ্কটকে তুলে ধরেছেন। সেই নাথু যখন বুঝতে পারে যে তারই হত্যা করা শুয়োরটি মসজিদের সিঁড়িতে কেউ নিয়ে গেছে মুরাদেরই নির্দেশে এবং এই কারণেই গোটা শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তার একাকীত্ব ও অসহায় অভিব্যক্তি চলাফেরা-আচার-আচরণে ও স্ত্রীর সঙ্গে বলা কথাবার্তায় পরিস্ফুট হয়েছে। কংগ্রেসের প্রভাতফেরী দলের মধ্যে থাকা নাথু মুসলিম লিগের মুরাদকে দেখে লুকিয়ে পড়েছে, পরে মুরাদকে একা পেয়ে ডেকেছে, কিন্তু মুরাদ চলে গেছে। উত্তেজনা প্রতি-উত্তেজনায় বিপর্যস্ত নাথুরা শেষ পর্যন্ত কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তারা দেহে খাটে, তাদের পরিশ্রম উঁচু শ্রেণির মানুষরা কাজে লাগায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের প্রাণের দাম থাকে না। নাথু নিজেই হয়েছে দাঙ্গার বলি, লেখক পরিহাসের সুরে তাই বলে ওঠেন : "নাথু বেটা মারে গেছে। নাইলে সে এক নজরেই চিনতে পারত। ও তো মুরাদ আলী।"[৭] 'তমস' উপন্যাসে লেখক নাথুর মতো এই নিম্নশ্রেণির জনতার মনোভঙ্গিকে যথার্থভাবে রূপায়িত করেছেন। কংগ্রেস-মুসলিম লিগ-হিন্দু সংগঠন প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা প্রকাশ্যে শান্তির জন্য বৈঠক করে, অথচ গোপনে তারাই চক্রান্তে লিপ্ত হয় ও দাঙ্গার ইন্ধন জোগায় ও গরিব মানুষদের কাজে লাগায়। এই সত্যটি প্রতিফলিত হয় চাপরাশির বক্তব্যে, তারা একজন অপরজনকে বলে ওঠে : "আমরা হাঁদা লোকেরা লড়াই করি। যারা চালাক, যারা বড় ঘরের লোক, তারা লড়ে না। এখানে এই সভায় হিন্দু এসেছে, শিখ এসেছে, মুসলমান এসেছে। অথচ সবাই কেমন ভাব ভালবাসার সঙ্গে দরদ দিয়ে কথা বলছে।" স্বাধীনতার আশা কিংবা পাকিস্থানের স্বপ্ন দরিদ্র মানুষদের দেখানো হয়েছে, তারা সেই স্বপ্ন দেখে আবেগের আতিশয্যে অমানবিক কার্যকলাপ করেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে মুটেদের মতো কারো কারো মনে এ জিজ্ঞাসাও জেগেছে : "স্বাধীনতা না হয় এলোই—কিন্তু আমাদের কী হবে? আমরা এখনও মোট বইছি, তখনও মোট বইব।"

অন্যদিকে, 'তমস' উপন্যাসে দেশভাগ পূর্ববর্তী ভারতের রাজনৈতিক চিত্রটিও পরিস্ফুট হয়েছে। কংগ্রেসিরা প্রভাবফেরী করে, তারা নর্দমা পরিষ্কারের আহ্বান জানায়, তারা হিন্দু-মুসলমান সকলকে

তাদের দলীয় কাজকর্মের শরিক করে। আবার কংগ্রেস দলেও রয়েছে বহু উপদল, তাদের মধ্যে রয়েছে মতবিরোধ, তারাও পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়। আপাতভাবে তারা কংগ্রেসি, কিন্তু সেই সুযোগে কেউ মহাজন, কেউ বা হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে, কেউ বা মুসলিম লিগের সংস্রবের জন্য অপরের সন্দেহের কারণ হয়। অন্যদিকে মুসলিম লিগের নেতারা প্রায় সকলেই পুরাতন কংগ্রেসি, তারা প্রচার করতে চায় যে কংগ্রেস হিন্দুদের সংগঠন। তারা পাকিস্থানের খোয়াব দেখে। তারা কংগ্রেস দলে যে সমস্ত মুসলমান কর্মী রয়েছে তাদের ইতর ভাষায় আক্রমণ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না: "আজিজ আর হাকিম—ওরা হল হিন্দুদের পা চাটা কুত্তা। হিন্দুদের ওপর আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই। আমরা ঘৃণা করি তাদের কুকুরদের।" এমনকি মৌলানা আজাদ হিন্দু নন, মুসলমান, তিনিই কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট—একথা বললে লিগকর্মী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে: "মৌলানা আজাদ হিন্দুদের সবচেয়ে বড় পা-চাটা কুত্তা। গান্ধীর পেছনে লাজ নেড়ে নেড়ে ঘোরে। এই কুত্তারা যেমন আপনার পিছন পিছন লাজ নেড়ে বেড়ায়।" এ উচ্চারণ প্রতীকী মর্যাদা পেয়ে যায়, কেননা এ উচ্চারণ কেবলমাত্র বিশেষ কোন লিগ কর্মীর নয়, পাকিস্থানের স্বপ্ন দেখা সকল কর্মীরই, এমনকি তাদের নেতা জিন্নারও। অন্যদিকে, এই সময়ে গুরুদ্বারে শিখেরা সংগঠিত হয়, অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করে, মেয়েদের একত্রিত করে, পুরুষদের নির্দেশেই তারা প্রাণের বিনিময়ে ইজ্জত রক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। আবার, হিন্দু সংগঠনের কর্মীরা বাচ্চাদের লাঠি খেলা, বর্শা ও অসিচালনা শেখায়, তারা সকলে মিলে অস্ত্র দিয়েই প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মোকাবিলা করতে চায়।

আবার, তীব্র এই উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে, কালের এই সংকটলগ্নে একদল শান্তিকামী মানুষ সকলকে মিলিত করার চেষ্টা করেছেন, যদিও সেই সময় 'শান্তির ললিতবাণী' 'ব্যর্থ পরিহাস' হয়েই ফিরে এসেছে। কম্যুনিস্ট দেবদত্ত গুরুদ্বারে ও হিন্দু পল্লিতে আর মীরদাদ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় পরস্পর বিবদমান গোষ্ঠীকে একত্রিত করতে চান, ঘৃণা ও বিদ্বেষকে প্রেম ও সদিচ্ছায় পরিবর্তিত করতে প্রয়াসী হন। দাঙ্গার দিনগুলিতে যখন অন্ধকার গলিখুঁজিতে প্রতিস্পর্ধী সংগঠনের বিদ্বেষ প্রবণেরা নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, আকাশ-বাতাস যখন ষড়যন্ত্রের বিষবাষ্পে কলুষিত হয়েছে, তখনও দেবদত্ত আর মীরদাদ কংগ্রেসের বক্সী, লিগের হায়াত বক্স ও হিন্দুত্ববাদী লালাকে একত্রিত করতে চেয়েছেন। পরিণামে দেবদত্ত হিন্দুত্ববাদীদের কাছে ভর্ৎসনা শুনেছেন আর মীরদাদ শুনেছেন লিগকর্মীদের কাছে। গুরুদ্বারে যখন দেবদত্ত সকলের আক্রমণের লক্ষ, মুসলিম মহল্লায় তখন মীরদাদের প্রাণ যাওয়ার উপক্রম। তবুও তাঁরা পিছু হটেনি। আসলে, দাঙ্গার জন্য উগ্র বিদ্বেষপ্রবণ কোনো কোনো মানুষ দায়ি, একটি ধর্মের সকল মানুষ দায়ি হতে পারে না, লেখক এই সত্যটিকে বারংবার স্পষ্ট করতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে যেহেতু ইংরেজরাই এদেশের শাসক, তাই দাঙ্গা সংগঠনে পরোক্ষভাবে তাদের ভূমিকাও বড় কম ছিল না। বরং একদিকে তারা ভেদনীতির দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের দূরত্ব বহুগুণিত করতে সচেষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে সময়ে-সময়ে কোন জাতিকে প্রত্যক্ষ মদতের দ্বারাও দাঙ্গা সংগঠনে বড় ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থেকেছে। আসলে, হিন্দু-মুসলমান—যে ধর্মেরই মানুষ হোক না কেন, সে তো ভারতবাসী আর শাসকের চোখে সে কৃপা ও করুণার পাত্র। সুতরাং ভারতবাসীদের মধ্যে শাসকরাই দাঙ্গা বাধায় আবার দাঙ্গাও থামায় তারাই। ডেপুটি কমিশনার রিচার্ড প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত, তাঁর আছে গবেষকের দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিকোণ অনুসারে হিন্দু ও মুসলমানের কোন ভেদ নেই। তিনি তাই স্ত্রী লিজাকে বলতে পারেন:

"তুমি এখানকার লোকদের একটু লক্ষ্য করে দেখেছ? মানুষগুলো এক ছাঁদের—মুখের ছাঁচ যেন সবার এক, এক রকমের নাক ঠোঁট, চ্যাটালো লম্বা ধরনের মাথা, কটা রঙের চোখ—এখানে সবারই কটা চোখ—এটা তুমি খেয়াল করেছ লিজা? ইংরেজ কন্যা লিজাও তাঁকে জানিয়েছেন—আমি তো কে হিন্দু, কে মুসলমান সেটাই আজও চিনতে পারি না।" প্রত্নতাত্ত্বিকের বীক্ষায় এই এক হওয়ার ও চিনতে না পারার কারণও ব্যাখ্যা করেন রিচার্ড ঃ "মধ্য এশিয়া থেকে সবার আগে যারা এখানে এসেছিল, শত শত বছর পরে তাদেরই উত্তরপুরুষেরা অন্যান্য দেশ থেকে এখানে এসেছে। জাত সবারই এক। এইসব লোক, যাদের বলা হয় আর্য,কয়েক হাজার বছর আগে তারা এখানে এসেছিল। আর যাদের বলা হয় মুসলমান, যারা এক হাজার বছর আগে এখানে এসেছিল--এরা সবাই একই ছাঁচের মানুষ। সবাই মূলে একই জাতির মানুষ ছিল।"

কিন্তু সেই রিচার্ডই যখন ডেপুটি কমিশনারের ভূমিকা পালন করেন, তখন যেন অন্য মানুষ। তখন তিনি কেবল শাসনযন্ত্রের পার্টস হিসাবেই কাজ করেন। হিন্দু মুসলমান-শিখের ভেদ আপাত, বহুকালের পূর্বপুরুষরা একই ছিলেন, সে সম্পর্কে যথার্থভাবে জ্ঞাত হয়েও ভাই যখন ভাইকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, শহরে যখন দাঙ্গা আসন্ন কিংবা ইতস্তত-বিক্ষিপ্তভাবে মানুষ মানুষকে হত্যা ক'রে চলেছে, তখন একজন দক্ষ প্রশাসক হয়েও রিচার্ড উদাসীন থেকে যান। কিছু সহৃদয় মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পরস্পর বিবদমান গোষ্ঠীর লোকজন যখন একত্রিত হয়ে তাঁর কাছে শান্তি রক্ষার আবেদন জানান তখনও তাঁকে কোন যথাযোগ্য পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না।

ছেচল্লিশের সেই কদর্য অন্ধকারের দিনগুলিতে প্রশাসকের সদর্থক ভূমিকা না নেওয়ার কারণে অবাধে ঘটেছে নরহত্যা, নারীর ইজ্জতহরণ, এমনকি নারী ও শিশু হত্যা। ফলত কাতারে কাতারে মানুষ নিজ বাসভূমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। এই নরঘাতী-নারীঘাতী যজ্ঞ কেমনভাবে সংগঠিত হয়েছিল, নিজ ভূমিতে মানুষ পরবাসী হওয়ার যন্ত্রণা কেমনভাবে অনুভব করেছিল তার চিত্রও 'তমস'-এর শিল্পী উপস্থাপিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, আমাদের সমাজে যথার্থ শিক্ষা না দেওয়ার কারণে আত্মিক উন্নতি ঘটে না। ছেলেবেলা থেকেই ব্রাত্য মানুষের প্রতি সমানুভূতি নয়, বরং ঘৃণা করতে শেখানো হয়। রণবীরের মতো বালককে হিংস্র ও খুনী হওয়ার দীক্ষা দেওয়া হয় মুরগি হত্যার মধ্য দিয়ে। সেই বালকই একদিন অত্যন্ত নির্মমভাবে নিষ্পাপ দরিদ্র আতরওয়ালাকে হত্যা করে। রক্তের বদলে রক্ত নেওয়ার অভিলাষে হাড়সর্বস্ব-ক্ষীণ বলদেব সিং খাপখোলা তলোয়ার দিয়ে গলিতে অবস্থানকারী নিরীহ দরিদ্র বৃদ্ধ করিমবক্সকে খুন করে। করিম বরাবর হরনাম সিংকে ভরসা দিয়ে এসেছিল, কিন্তু সেও বাধ্য হয়ে তাকে বাড়ি ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে, আজীবনের পরিচিত জন ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। বাস্তবিকই ঘটেও তাই। খানপুর থেকে দাঙ্গাবাজরা গ্রামে প্রবেশ করে, গ্রামের লিগ নেতা আশরাফ আর লতি পাকিস্তানের ধ্বনি দেয় আর বৃদ্ধ হরনাম সিংকে স্বজন-স্বভূমি ত্যাগ করতে হয় যুগপৎ বেদনায় ও আতঙ্কে। গুরুদ্বার থেকে মেয়েরা বেড়িয়ে এসে দেখে আগুন লেগেছে, তারা হাহাকার করতে থাকে, গঞ্জে শুরু হয় লুণ্ঠন, তারা ঝাঁপ দেয় ইঁদারায়। ইতিহাসও তো এই সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়েছে। অন্যদিকে 'তমস'-এর শিল্পী ধর্মান্তরিতকরণের চিত্রকেও উপস্থাপিত করেন। ইকবাল সিংয়ের শরীর থেকে শিখের সমস্ত লক্ষণ মুছে ফেলে মুসলমানের চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয়। তখন সে মুসলমানের শত্রু থাকে না ঃ "আর কাফের নয়, এখন মুসলমান। ওর সামনে সব মুসলমানের দরজা খোলা।" কিন্তু কেমন থাকে ইকবাল সিং? "খাটিয়ার ওপর শুয়ে থেকে সেদিন ইকবাল আহমেদ সারাটা রাত ছটফট করে কাটাল।"[৬]

তিন

ধর্মান্তরিত হয়ে পাকিস্থানে ইকবাল সিংরা ইকবাল আহমেদ হয়েও অনিদ্রায় জীবন কাটায় আর আখতার হোসেনের মনে হয় ঃ "এই উপমহাদেশের প্রতিটি মুসলমান বহু বছর ধরে শারীরিক-মানসিক ও হৃদয়ের কষ্টে আছে।" আবদুস সামাদ উর্দুভাষায় লেখা তাঁর 'দো গজ জমিন' উপন্যাসে এই যন্ত্রণার চিত্রকেই বিধৃত করতে চেয়েছেন। স্বাধীনতার প্রাক পটভূমিতে পশ্চিম ভারত তথা বর্তমান পাকিস্থানের প্রেক্ষাপটে মূলত হিন্দু ও শিখদের যন্ত্রণার বয়ান ভীষ্ম সাহানির 'তমস' আর খিলাফৎ আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী আটের দশক পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশ তথা ভারত, পাকিস্থান, বাংলাদেশের এক বৃহৎ পটভূমিতে মুসলমানদের যন্ত্রণার প্রতিবেদন আবদুস সামাদের 'দো গজ জমিন'।"

এই বৃহৎ প্রেক্ষাপটকে উপজীব্য করলেও সামাদ ইলতাফ হোসেন ও তার পরিবারের কাহিনিকে অবলম্বন করেই উপন্যাসটি গড়ে তুলেছেন। যৌবনকালে ঔপনিবেশিক শাসকবিরোধী জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে আকৃষ্ট ইলতাফ হোসেনের পরিবার কেমনভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের মতোই বিভক্ত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, শেখ সাহেবের স্ত্রী বিবি সাহেবার আত্মাও কীভাবে ক্রমাগত দগ্ধ ও দ্বিধাবিভক্ত হতে থাকল, উত্তরাধিকারীরা কতটা যুগপৎ সুবিধাভোগী ও সঙ্কটগ্রস্ত হল— সে সমস্ত কিছুর চিত্রই রূপায়িত হয়েছে এ উপন্যাসে।

'তমস'-এর মতোই 'দো গজ জমিন'-এ পরিস্ফুট হয়েছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বরূপটি। খিলাফৎ আন্দোলন যখন তুঙ্গে, গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে হাল ধরেছেন, শাসক ইংরেজরাও যথেষ্ট শঙ্কিত, তখন তার শরিক হয়েছেন বিহার শরিফের নিকটবর্তী বিনের ছ আনা জমিদারির অংশীদার শেখ ইলতাফ হোসেন। সমস্ত এলাকার মানুষের কাছে তিনি পেতেন চরম শ্রদ্ধা ও সম্মান, তাঁর অন্দরও লক্ষণীয়ভাবে লক্ষ্মীশ্রী হয়ে ওঠে সৈয়দবংশীয়া স্ত্রীর কল্যাণে। সেই সময় মৌলানা শওকত আলি, মৌলানা মহম্মদ আলি, গান্ধিজী, বি আম্মা প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিনে সমাবেশ করেছেন এবং শেখ সাহেবও সেই সব নেতাদের আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন। তিনি বিহার শরিফ থেকে পাটনায় থাকতে শুরু করলেন, কেননা পাটনায় তখন রাজনৈতিক তরঙ্গ চরমে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের বড় অংশ যখন কামাল আতাতুর্ককে আত্মীয় বলে স্বীকার করতে অসম্মত হল তখন গান্ধিজী তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক করে নিলেন আর শেখসাহেবের বিনহাউস হয়ে উঠল জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। শেখ সাহেবের বড় পুত্র সরোয়ার হোসেন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়। সরোয়ারের বিয়ে তিনি তাঁর অনাথ ভাইঝির সঙ্গে দেন। ভাগ্নে আখতার হোসেন কলকাতা থেকে বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে এলে তাঁর সঙ্গে বড় মেয়ে আসমত বিবির বিয়ে দেন। অন্যদিকে মেজ ছেলে আসগার শেখসাহেবের মামাবাড়ি ইসলামপুর বেড়াতে গেলে সেখানে সেই ধনপতি মামা শেখসাহেবকে না জানিয়ে তাঁর আদরের নাতনির বিয়ে দিলেন। দুই পরিবারের মধ্যে আসা-যাওয়ার সম্পর্ক ছিল না। বিয়ের খবর তিনি দিলেন মিষ্টি পাঠানোর মধ্য দিয়ে। বিয়ের পর আসগার তাঁর শ্বশুরবাড়ি ইসলামপুরে থেকে গেলেন, অবশ্য বিহার শরিফে আনাগোনা তাঁর ছিল। অন্যদিকে, শেখসাহেবের নির্দেশে তাঁরই বাড়িতে থাকতেন ভাগ্নে তথা জামাই আখতার হোসেন। অকালমৃত শেখসাহেবের যাবতীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তিনি, তাঁরই আদর্শে বিবিসাহেবার নির্দেশে জমিদারি দেখাশোনা করতে থাকলেন,

আদর্শবান কংগ্রেসকর্মী হিসাবে তিনি ইংরেজদের বিরাগভাজন হয়ে বারংবার জেলও খাটলেন। অন্যদিকে আসগার হোসেন ছিলেন আড়ম্বরপ্রিয় মানুষ, তাঁর দাদা-শ্বশুর ইংরেজ গভর্নরকে নিমন্ত্রণ করতেন, স্তাবকতা করতেন, অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন, শেখসাহেবের পুত্র হয়েও এসবই তাঁর ভাল লাগত। এইসময় দেশে নেহেরুর রিপোর্ট প্রকাশিত হলে মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হল আর মুসলিম লিগও যেন যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। সুচতুর ও সুবিধাবাদী লিগ নেতারা মুসলমান সম্প্রদায়ের কংগ্রেসকে অপছন্দ করার ও তাদের প্রতি বিরূপ হওয়ার দিকটি উপলব্ধি করে ও তা নিজেদের কাজে লাগায়— "আর এই অপছন্দের সুযোগ নিয়ে সেই সব নেতারা সুসলমানদের মনের মধ্যে এই কথা ঢুকিয়ে দিলেন যে, তাঁরা এদেশে সাতশো বছর রাজত্ব করে এসেছে, আর কংগ্রেস স্বাধীনতা অর্জন করে তাঁদের হিন্দুদের গোলাম বানাতে চান। সেজন্যেই তাদের আলাদা পার্টির প্রয়োজন।" আসগার হোসেন তাতে লিগ নেতাদের বিন হাউসে আপ্যায়ন করলেন, কংগ্রেস কর্মী আখতার হোসেন অত্যন্ত আহত হলেন। দেখা গেল কয়েকদিন পর আসগার মুসলিম লিগে যোগ দিলেন। অন্যদিকে সরোয়ার হোসেন বিলেতে আই.সি.এস.-এ ব্যর্থ হয়ে পাটনায় একজন উকিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তিনি আসগারের লিগে যোগদানে ও আখতারের কংগ্রেসকর্মীর ভূমিকায় আনন্দিতই হতেন। অন্যদিকে ধর্মপ্রাণা বিবিসাহেবা কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের ব্যবধানকে উপলব্ধি করতে পারেননি, যদিও বিবিসাহেবা জানতেন—কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কল্যাণ চাইছে, অন্যদিকে লিগ চাইছে মুসলমানের কল্যাণ। বিবিসাহেবার এই দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতায় তখনকার মুসলিম মানসটি স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। বাড়ির অন্দরে উভয় দলের কর্মীদের জন্যই পৃথক-পৃথক খাদ্য তৈরি করত মেয়েরা। অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের মতো বিন হাউসও ভিতরে-ভিতরে বিভাজনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল, যদিও তার সুদূরপ্রসারী ফল বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি কারো। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে পাটনা ও বিহার শরিফ—এই যুক্ত নির্বাচনকেন্দ্রে কংগ্রেস দাঁড় করায় খাজা আব্দুল হামিদকে আর লিগ দাঁড় করায় মৌলবি আব্দুল গণিকে। কংগ্রেসের মুসলমান সদস্যদের প্রতি লিগ কর্মীদের বিদ্রুপ আমরা 'তমস'-এ দেখেছি। সামাদও দেখিয়েছেন আজাদকে জিন্না-প্রদত্ত 'শোবয়' অভিধাটি বিহারের এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পৌঁছে দেয় গণি। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা সেখানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে চরম অসভ্যতা করে, অথচ সেই ছাত্ররাই বাড়ি ফিরলে অভিভাবকরা যাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। স্তাবক দাদাশ্বশুরের যোগ্য উত্তরাধিকারী মুসলিম লিগ কর্মী আসগার পাকিস্থানের ধ্বনি ভুলে মুসলমানদের একত্রিত করেন। অর্থাৎ বোঝা যায় উচ্চশ্রেণির কোন্ সুবিধাবাদী নেতারা পাকিস্থানের জিগির তুলেছিলেন এবং তাঁরা নিজেদের সুযোগ চরিতার্থ করার জন্য কীভাবে গরিব মুসলমানদের নাচিয়েছিলেন। এই আসগার হোসেনই পাকিস্থান হওয়ার পর ভারত থেকে অর্থ নিয়ে গিয়ে সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখদের ছেড়ে যাওয়া প্রাসাদোপম বাড়ি ও বিপুল সম্পত্তির মালিক হন। অথচ যাদের কানে তিনি এই পাকিস্থানের ধ্বনি পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেই দরিদ্র মুসলমানদের দিকে আর ফিরেও তাকাননি। এমনকি পাকিস্থানের শরণার্থী মুসলমানেরা যখন তাঁর দখল করা বাড়িতে আশ্রয় খুঁজতে চায় তখন নতুন সরকার ও তার প্রশাসনের সহায়তায় তাদের বাড়ির বাইরে বের করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ আখতার হোসেন ও আসগর হোসেনের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বের জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বরূপটি যেমন বোঝা যায়, তেমনি সেই আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের যথার্থ অবস্থানটিও স্পষ্ট হয়।

'তমস'-এর মতোই 'দোগজ জমিন'-এও আছে দাঙ্গার চিত্র। 'তমস'-এর মতোই এখানেও দাঙ্গা পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত হয়েছে। নোয়াখালি ও কলকাতার দাঙ্গার সময় বিহারের এক হিন্দু গ্রামবাসীর পকেটে পাওয়া যায় চিরকুট, তাতে কিছু সংকেত লেখা ছিল আর ছিল কিছু স্থান ও ব্যক্তিনাম। গ্রামবাসীরা উপলব্ধি করেছিল চিরকুটের মাধ্যমে প্রচার ক'রে দাঙ্গা বাঁধানো হচ্ছে। এছাড়াও দাঙ্গার আগে রাতে তারা শুনেছে ঝনঝনাৎ আওয়াজ ও বজরংবলি ধ্বনি। 'তমস'-এ তারা শুনেছিল 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি। দুটি ক্ষেত্রেই এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামে গিয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়েছে। "দাঙ্গায় খোঁজখবর নিয়ে একথা জানা যায় যে, যে গ্রামে দাঙ্গা হয়, সে গ্রামের হিন্দুরা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তারা স্থানীয় এলাকায় দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেনি।" মুসলমান গ্রামবাসীরা যখন তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের রাতের বিশেষ ধ্বনি সম্পর্কে কিংবা নতুন নতুন লোকের যাতায়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে, তখন তারা যথাক্রমে মন্দিরের পুজো এবং মেয়েদের নব সম্বন্ধের কথা বলেছে—যা যথার্থ সত্য নয়। 'তমস'-এ বিপদের দিনে ওরুদ্বারে শিখেরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং আসন্ন সংকটে তাদের মেয়েরা সম্ভ্রম রক্ষার কারণে কুয়োয় ঝাঁপ দিতে বাধ্য হয়েছিল—এ উপন্যাসেও অনুরূপ চিত্র পাই। এখানেও দেখা যায়, গভীর রাতে দাঙ্গার মুহূর্তে পুরুষরা একত্রিত হয়ে মৃত্যু আসন্ন জেনে একে অপরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে আর মেয়েদের বলা হয়েছে কুয়োয় ঝাঁপ দিতে, তারা তা মেনেও নিয়েছে। আবার মুসলমানদের ঘরে ভ্রাতা হিন্দু যারা লালিত পালিত হয়েছে তাদের ভূমিকাও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—"যে বাড়ির দরজা ভাঙা গেল না, সেই বাড়িতে থাকা মানুষরা নিজের চোখে দেখল, যে হিন্দু ছেলেরা তাদের আশ্রয় প্রতিপালিত হচ্ছে, তারা শুধু দরজাই খুলে দিল না, লুকিয়ে থাকা রমণী ও শিশুদের সন্ধান জানিয়ে দিল। একই ঘটনা প্রতিটি গ্রামে পুনরাবৃত্ত হতে লাগল।" বাংলাদেশের হিন্দু গৃহে প্রতিপালিত গরিব ঘরের মুসলমান ছেলেরা ছেচল্লিশের ভয়াবহ দাঙ্গার দিনে একই ধরনের আচরণ করেছিল, যা আমরা পরে দেখব জ্যোতিময়ীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে।

মৌলানা আজাদের শিষ্য ও গান্ধী-নেহেরুর অনুগামী ভদ্র-ভব্য কংগ্রেসকর্মী মৌলানা আইনুল আনসারি দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় গান্ধিজির সঙ্গী হতে গিয়ে হত্যার শিকার হলেন আর রাজা কংগ্রেসের স্পষ্টবাদী নেতা আব্দুল বারি যথার্থ সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন। অর্থাৎ স্থান-কাল নির্বিশেষে দাঙ্গার চরিত্রের কোন পার্থক্য নেই। সর্বোপরি, সবক্ষেত্রেই দেখা যায় 'ব্যর্থ পরিহাস' হিসেবে ফিরে আসে 'শান্তির ললিত বাণী'।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের রাজনীতির যথার্থ স্বরূপটি চিত্রিত হয়েছে 'দো-গজ জমিন'-এ। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে আখতার হোসেনের মতো কংগ্রেসকর্মী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন: জাতীয় আন্দোলন দেশ বিভাজন করার জন্য নয়, সংহতির ভিত্তি দৃঢ় করার জন্য। কিন্তু স্বাধীনতার পরে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, কংগ্রেস কর্মীদের আচরণ আন্দোলনকারী দলের মতো নয়, ক্ষমতা ভোগকারী দলের মতো। তাই যে মহম্মদ ইউনুস প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে লিপিকর্মী হিসেবে দেশে বিভেদের বীজ বপনে সহায়তা করেছিলেন, কংগ্রেসকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন, তাঁকেই কংগ্রেসে স্থান দেওয়া হয়, অথচ আখতার হোসেনের মতো নিষ্ঠাবান জেলা কংগ্রেস সভাপতি ও কর্মীকে তা জানানোর প্রয়োজন অনুভব করেন না রাজ্য নেতারা। এমনকি কংগ্রেস তার নির্বাচনের প্রার্থীকে আদর্শের দিক দিয়ে বিচার না ক'রে, জাতি ও ধর্মের দিক দিয়েই বিচার করে। আখতার হোসেন-অযোধ্যাপ্রসাদের মতো কংগ্রেস সেবক প্রত্যক্ষ করেন দলের স্বরূপটিকে,

সে রণনীতি অনুসারে যে কেন্দ্রে যে ধর্ম কিংবা সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি, সেই সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষকেই সে কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়। অর্থাৎ তাঁকে কংগ্রেসি হতে হবে তার কোন মানে নেই, তার আদর্শকে মেনে চলতে হবে তারও কোন মানে নেই, কেবল তাঁকে সেই ধর্ম বা সম্প্রদায়ের হতে হবে। নির্বাচনে ব্যয় করার মতো অর্থ যাঁর বেশি তিনিই সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হন। বলতে দ্বিধা নেই, স্বাধীন ভারতে এই যে ভয়াবহ ও ক্ষতিকর রাজনীতির সূত্রপাত কংগ্রেস করেছিল তা আজও সমমাত্রায় কিংবা কিছুটা বেশি মাত্রায় বহমান। রাজ্য কংগ্রেস মহম্মদ ইউনুসকে প্রার্থী করলে আখতার অনুগত সৈনিকের মতো তা মেনে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অযোধ্যাপ্রসাদের পরামর্শে তিনি যখন দিল্লিতে পৌঁছান, তখন দেখেন কংগ্রেসের টিকিট পাওয়ার জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিকে, তাঁর মনে হয়ঃ "ইংরেজদের লুটপাটের পর ভারতীয়দের কাছে এখনো এত টাকা ছিল যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য মহানন্দে সে টাকা ব্যয় করতে পারেন।" আখতার হোসেন মৌলানার নির্দেশে কংগ্রেসের টিকিট পেলেন, জয়ীও হলেন, মৌলানার নির্দেশেই তিনি প্রতিমন্ত্রী হলেন। যে ব্যক্তি কংগ্রেসকে গালমন্দ ক'রে এবং জাতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে একদা লিগের বাহবা কুড়িয়েছিলেন সেই ইউনুসকেই ছ' মাস পর পূর্তমন্ত্রী করা হল অর্থাৎ তার অর্থ হল কংগ্রেস কর্মী হিসেবে আজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ ক'রে যিনি নিজ সম্প্রদায়ের যাবতীয় লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন সেই আখতার হোসেনকে তাঁর নির্দেশেই কাজ ক'রে যেতে হবে। অন্যদিকে, আখতার প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও আদর্শ মেনে চলতেন, ব্যক্তিগত কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুপারিশ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। জমিদারী প্রথা বিলোপের পর যখন হামিদের মতো শিক্ষিত অথচ প্রতিযোগিতায় পেরে না ওঠা অথচ চাষেও খাটতে না পারা যুবকদের মনে হতাশার জন্ম হল, তখন পিতা আখতারের দৃঢ় মনোভঙ্গি তার হতাশাকে বহুগুণ ক'রে তুলল। হামিদ দেখল ঘুষ দিয়ে তার বন্ধুরা সেচ দপ্তরে চাকরি পায়, আখতার উপলব্ধি করলেন সেচ দপ্তরে চাকরির ব্যাপারে অসদুপায় অবলম্বন করা হয়েছে। তিনি মর্মে মর্মে বুঝতে পারলেন, পুরনো কংগ্রেস কর্মীদের তুচ্ছ জ্ঞান করা হচ্ছে। দ্বিতীয় পার্লামেন্টারি নির্বাচনে মহম্মদ ইউনুসকে প্রার্থী করা হলে আখতার তাও মেনে নিলেন, কারণ তাঁর আজও বিশ্বাস রাজনীতি কেবলমাত্র পার্লামেন্টে প্রতিনিধি হওয়ার জন্যই নয়, রাজনীতি জনগণের সেবা করার মাধ্যমও বটে। সে নির্বাচনে মহম্মদ ইউনুস প্রচুর টাকা ছড়িয়েও জিততে পারলেন না, অথচ তাঁকে মন্ত্রীর সমতুল্য পদ দেওয়া হল। চোখের সামনে অসহায়ভাবে তাঁর এলাকায় কংগ্রেসের পরাজয় দেখতে হল নিষ্ঠাবান কর্মী আখতারকে। তৃতীয় বারের নির্বাচনে আখতারকে প্রার্থী করলে তিনি আরও ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি হলেন—ব্যাবসায়ীদের কাছে অঢেল টাকা নেওয়া হচ্ছে আর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে নির্বাচনে জয়ী হয়ে তাদের প্রয়োজন মেটানো হবে। অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি জনগণের হয়ে কাজ করবেন না, কাজ করবেন চাঁদা দিতে সমর্থ ধনপতি ব্যাবসায়ীদের জন্য। এইভাবেই আখতারের দৃষ্টিকোণে লেখক রাজনীতিতে আদর্শ চ্যুতি ও নতুন নিয়মনীতি প্রবর্তনের চিত্রকে পরিবেশন করেছেন।

'দো গজ জমিন'-এ কীভাবে পাকিস্থান হল তা যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি এ জিজ্ঞাসাও বারে বারে উত্থিত হয়েছে যে, কারা পেল পাকিস্থান, কাদের জন্য তৈরি হল পাকিস্থান? পাকিস্থান আসগার হোসেনের মতো উচ্চশ্রেণির মানুষের জন্য, সম্ভ্রান্ত পরিবারের আড়ম্বরপ্রিয় মানুষের জন্য। এই সব নেতাদের পূর্বপুরুষ একদা ঔপনিবেশিক শাসকদের আপনজন ছিলেন, তাঁরা গরিব মুসলমানদের পাকিস্থানের ধ্বনি তুলে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, কিন্তু পাকিস্থান হওয়ার পর তাঁরা কোনো

দিকে না তাকিয়ে বাড়ি, গাড়ি ও ব্যাবসার দিকে নজর দিয়েছেন—"গেল যারা, তাদের নতুন দেশে যাবার সঙ্গতি ছিল, সেই সব লোক যারা খেতে খামারে মিলে কারখানায় কাজ করত, বিড়ি বাঁধত, আজ খেটে রোজগার করে কাল কী খাবে কালকের জন্য তুলে রাখত, সেইসব মানুষ যদিও মুসলিম লিগকে সমর্থন করেছিল, কিন্তু অন্য দেশের স্বপ্ন দেখার জোর তাদের মধ্যে অবশ্যই ছিল না। তারা সেখানেই থেকে গেল, যেখান থেকে আসছে। তাদের যারা ব্যবহার করেছিল সেইসব মস্তিক তাদের ত্যাগ করে সরে পড়েছে। সমস্ত গাড়ি রেল লাইনেই দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ইঞ্জিন তাদের থেকে উধাও।" দেশ থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে জলের দামে তাঁরা জমি-বাড়ি-আসবাবপত্র সম্পত্তি সমস্ত কিছু দখল করেছে। গরিব মুসলমানদের তারা আশ্রয় দেয়নি, পাকিস্থানের প্রশাসনের সহায়তায় তাদের বিতাড়িতও করেছে। এমনকি পাটনার প্রতিষ্ঠিত উকিল সরোয়ার হোসেন পাকিস্থানে গিয়ে যথার্থ মর্যাদা পান না, সেখানেও স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আসগার হোসেনের মতো সুযোগ সন্ধানীদের কাছে পাকিস্থান আল্লা সৃষ্ট মহিমা হলেও সরোয়ার হোসেনের মতো মুসলমানের কাছে পাকিস্থান জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্র। এই জীবন সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি ভুলে গেছেন বংশগৌরব ও আভিজাত্যের সম্ভ্রম। সরোয়ার তাই বলে ওঠেন : "এখন আমাদের সংসার দেখতে হচ্ছে, মুখের অন্ন জোগাড় করতে হচ্ছে, সেজন্য লাভ ক্ষতির হিসেব আমরা চিকঠাক করে নিই।" ভারতে থাকা বাপ-ঠাকুরদার জমি বিক্রি করলে সম্ভ্রমে আঘাত লাগবে জেনেও সে কাজ তাঁকে করতে হয়। যে সরোয়ার ভারতে প্রতিষ্ঠিত উকিল হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র ভাইয়ের সন্তানদের ভালোবেসে পাকিস্থানে গেছিলেন সেই সরোয়ারের মৃত্যুর পর আসগারের পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। হামিদের মতো শরণার্থীরা পাকিস্থানে নয়, শেষ পর্যন্ত আরবে আশ্রয় খোঁজে।

আবার যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্থান গড়ে উঠেছিল, সেখানেও নতুন সমস্যা দেখা দেয়। ভারতের বিহার রাজ্য থেকে চলে গিয়ে পূর্ব পাকিস্থানে আশ্রয় নেওয়া বিহারী মুসলমানদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলমানদের সংঘাত দেখা দেয়। চাকরি না পেয়ে হতাশ হামিদ চাচু মামার কৌশলে পূর্ব পাকিস্থানে গিয়ে শোনে সেখানে চাকরির চেয়ে মানুষ অনেক বেশি। তবুও চাচু মামার আত্মীয় বদরুল ইসলামের সহযোগিতায় সে সেখানে চাকরি পেল এবং প্রকৃত চিত্রটি উপলব্ধি করতে পারল। পূর্ব পাকিস্থানে বিহারী মুসলমানরা ভাবে তাদের আত্মীয় যারা পশ্চিম পাকিস্থানে আছে তারা যেন স্বর্গসুখ পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাঙালি মুসলমানদের তারা ঘৃণা করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিকে পাকিস্থানি সেনারা বাঙালিদের উপর বর্বর অত্যাচার চালায়, ফলত এক কোটি বাঙালি ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে বাঙালিদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে হাজার হাজার বিহারীরাও ভারতে চলে আসে। হামিদ পূর্ব পাকিস্থানে গিয়ে চাকরি পেয়ে বদরুলের মর্জিত মেয়ে নাজিয়াকে বিয়ে করে সুখে সংসার পেতেছিল। সম্ভ্রান্ত বদরুল স্থানীয় মুসলমান হয়েও ছিলেন সহৃদয়, তিনি গরিব বিহারী মুসলমানদের আশ্রয়ও দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্বেষ বিষ তাঁদের শান্তির দিনের অবসান ঘটাল। বদরুল ও তাঁর স্ত্রীকে খান সেনারা ধরে নিয়ে গেল আর হামিদ ও নাজিয়াকে মুক্তি যোদ্ধারা বন্দী করল। এই নৃশংস অত্যাচার একথা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিটি কতটা অসার।' এ লড়াই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের নয়, মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের। হামিদের মতো বিহারী মুসলমানেরা পূর্ব পাকিস্থানে গিয়ে চাকরি জোগাড় করতে পারে ঠিকই, কিন্তু তাদের অন্যভাবে সঙ্কটগ্রস্ত হতে হয়, সুতরাং তাকে আবার ভারতে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু ভারত তাকে

আশ্রয় দেয় না, কেননা সে পাকিস্থানি, সুতরাং হামিদকে নেপাল হয়ে পশ্চিম পাকিস্থানে যেতে হয়। সেখানে গিয়েও সে দেখে মেজো মামা আসগার ও বড় মামা সরোয়ারের পরিবারের দূরত্বকে। সে শোনে বড় মামা সরোয়ার পাকিস্থানে এসে কতটা সমস্যায় পড়েছিলেন। সে উপলব্ধি করে আঞ্চলিকতা সেখানে কতটা প্রবল, পাঞ্জাবী মুসলমান পাঞ্জাবিকে দেখে, সিন্ধি মুসলমান সিন্ধিকে আপনজন ভাবে।

এইভাবেই আবদুস সামাদ তাঁর 'দো গজ জমিন' উপন্যাসে উপমহাদেশের মুসলমানদের শারীরিক-মানসিক কষ্টকে তুলে ধরেন। তিনি দেখাতে চান ভারতে তারা সন্দেহের শিকার, বাংলাদেশে তারা লাঞ্ছনার শিকার আর পাকিস্থানে তারা অবজ্ঞার শিকার। বাংলাদেশে শরণার্থীদের নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়। আবার পাকিস্থানেও উচ্চশ্রেণির মুসলমানরা একদিকে যেমন নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা করে, অন্যদিকে তেমনি নিজ জাতি ব্যতীত অপর জাতির দিকে ফিরেও তাকায় না। উপরন্তু পাকিস্থানিদের হৃদয়েও শরণার্থীদের জন্য কোন স্নিগ্ধ স্থান নেই।

চার

ভীষ্ম সাহানি তাঁর 'তমস' উপন্যাসে দাঙ্গার ফলে তৎকালীন পশ্চিম ভারতে হিন্দু ও শিখদের যন্ত্রণাকে দেখিয়েছেন, আবদুস সামাদ তাঁর 'দো গজ জমিন' উপন্যাসে দেখিয়েছেন দেশভাগের ফলে উপমহাদেশের মুসলমানদের কষ্টকে আর জ্যোতির্ময়ী দেবী সম্পূর্ণ ভিন্ন বীক্ষায় তাঁর 'এপার ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে দেশভাগ-দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত নারীজাতির সঙ্কটকে উপস্থাপিত করেছেন। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' শারদীয়া সংখ্যায় জ্যোতির্ময়ীর উপন্যাসটি 'ইতিহাসে স্ত্রী পর্ব' নামে প্রকাশিত হয় এবং উপন্যাসটি তিনি প্রকাশকের অনুরোধে পরিবর্তন করলেও তাঁর স্বকীয় বীক্ষাটি স্পষ্ট হয় গ্রন্থের 'উৎসর্গ' ও 'আমার কথা' অংশ দুটিতে। এ গ্রন্থ তিনি উৎসর্গ করেছেন—'সকল যুগের সকল দেশের অপমানিতা লাঞ্ছিতা নারীদের উদ্দেশ্যে'। উপন্যাসের 'আমার কথা' অংশে তিনি স্পষ্ট ভাবে জানান : "মহাভারতের পর কোনো দেশের কোনো ইতিহাসের পাতায় 'স্ত্রী পর্ব' নামে কোনো পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় আছে কি না আমার জানা নেই।

এবং মহাভারতেও যে স্ত্রী পর্বের কাহিনী আছে তার নাম স্ত্রী পর্ব হলেও সেটা বস্তুত নর-নারী দুজনেরই শোক-বিয়োগ-মৃত্যু-বিচ্ছেদ-বেদনার কাহিনী,—যে মর্মঘাতী শোক সকল সম্পর্কেরই বিয়োগ-বিচ্ছেদের মূল কথা। তাতে পিতা পুত্র ভাই বন্ধু সুজন আত্মীয়—সব সম্পর্কই আছে।

মোট কথা হ'লো আসল স্ত্রী-পর্ব স্বয়ং বেদব্যাসও লিখতে পারেননি।" কেন বেদব্যাস এই 'স্ত্রী পর্ব' লিখতে পারেননি, সেকথা ও তিনি জানান : "কাপুরুষ তো ইতিহাস লেখে না। নারী কবি মহাকবি নেই। থাকলেও নিজেদের মান, লজ্জা, মর্যাদা, সম্ভ্রমহানির কথা লিখতে পারতেন না। সে ভাষা আজও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি।

তাই স্ত্রী-পর্বের কোনো ইতিহাসই কোথাও নেই।"[৯৬]

জ্যোতির্ময়ী সেই ইতিহাসই লিখতে চান। সে ইতিহাস তাই পুরুষের শৌর্যবীর্যের জয়ধ্বনিমুখর ইতিহাস নয়, তারই আড়ালে থাকা নিরুপায় নারীর পরম বেদনার ও চরম লাঞ্ছনার ইতিহাস।

হস্তিনাপুরের যাজ্ঞসেনী কলেজের অধ্যাপিকা, যিনি ভারতবর্ষের ছাত্রীদের ইতিহাসের পাঠ দেন, সেই সুতারা দত্তের স্রষ্টাপ্রদত্ত ভাষ্য স্মরণের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের সূত্রপাত। সুতারা তার বেদনাহত

জীবন নিয়ে উপলব্ধি করেছে ইতিহাসকার লেখেন বিজয়ীর ইতিহাস, পরাজিতের ইতিহাস কখনো লেখা হয় না; লেখা হলেও তা অন্ধকারে আচ্ছন্ন, মিথ্যা কথায় পূর্ণ। ইতিহাস মানে রাজনৈতিক ইতিহাস—রাজাদের ইতিহাস, বাধাহত-লাঞ্ছিত মানুষের কথা ইতিহাস বলে না। অর্থাৎ ইতিহাস বলে না সুতারা দত্তের মতো অপমিত নারীর কথা। সুতরাং সুতারা দত্তের কাহিনির মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয় দেশভাগের আর এক ইতিহাস, সে ইতিহাস রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, সামাজিক ইতিহাস। নেহেরু-জিন্না-গান্ধিজির কথায় পূর্ণ নয়, লাঞ্ছিত নারীর বেদনার অশ্রুতে পূর্ণ। এ কাহিনির সূত্রপাত সেইখান থেকে যেখানে প্রথাগত ইতিহাসকার থেমে যান, সেই স্থির বিন্দু থেকেই মূক কথাকে মুখর করে তোলেন ঔপন্যাসিক। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এ সত্যচরণ আর্য সমাজের প্রতিনিধি হয়ে বিজিত অনার্যের ইতিহাস লেখা হয়নি বলে আক্ষেপ করেছিলেন আর সুতারা দত্ত স্বয়ং নির্মমতার বলি হয়ে ও লাঞ্ছিত নারীর প্রতিনিধি হয়ে তাদেরই কথা বলতে প্রয়াসী হয়েছে।

১৯৪৬-এর আগস্টে মুসলিম লিগের ডাকে দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং হয়েছিল, সেই রক্তাক্ত ও ভয়াবহ দিনগুলিতে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়নি, তারই তরঙ্গ এসে পৌঁছেছিল বাংলার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে। কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে আসা পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা তাদের নিজের নিজের গ্রামে ও পাড়াতে সেইসব মনুষ্যত্বহীন মুহূর্তগুলির বর্ণনা করেছেন, সে বর্ণনায় অনেকক্ষেত্রেই অতিরঞ্জনও থেকে গেছে। তারই ফলে পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে শান্ত-নিস্তরঙ্গ নোয়াখালিতে দাঙ্গা এবং পরবর্তীকালে একইভাবে সেই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে প্রথমে বিহারে ও পরে পাঞ্জাবে। পাঞ্জাব ও বিহারের দাঙ্গা রূপায়িত হয়েছে যথাক্রমে 'তমস' ও 'দো গজ জামিন'-এ আর নোয়াখালির দাঙ্গা রূপায়িত হয়েছে 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'-তে।

বাংলাদেশের গ্রাম শান্ত-নিস্তরঙ্গ, সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই পাশাপাশি বাস করে এবং নিজ নিজ ধর্মাচরণ করে। গরিব মুসলমানদের সন্তানরা বর্ণহিন্দু পরিবারে পালিত হয়, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে চমৎকার আন্তরিক সম্পর্ক ও মেল বন্ধন গড়ে ওঠে। সুতারার বাবা গোপাল দত্ত আর সাকিনার বাবা তমিজউদ্দিন একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাঁরা একই গ্রামে থাকেন, পরস্পরের সুখে দুঃখে সঙ্গী হন। সুতারা ও সাকিনা একই বিদ্যালয়ে পড়ে, সুতারাদের বাড়িতে রহিম ও করিম কাজ করে, সাকিনাদের বাড়িতে কাজ করে রহিমের ভাই। সাকিনা-ফতিমা-সোফিয়া-হাসিনা-মেহের-রোশন এবং সুতারা-ঊষা-বীণা-অলকা-দুর্গা গ্রামের মধ্যে একসঙ্গে মহানন্দে খেলা করে—পুকুরে মাছ ধরে, জলে সাঁতার কাটে, গাছে পাকা ফল পাড়ে।

কিন্তু এরই মাঝে সুতারার জামাইবাবুর চিঠি আসে কলকাতায় দাঙ্গা বেঁধেছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় বিপর্যয়, শ্রীমণ্ডিত গ্রামগুলিতে নীল করে ফেলে বিদ্বেষের বিষাক্ত ছোবল। পরিচিত আপন জনের হাতেই নিধন হয় মানুষ, ইজ্জত হারায় নারী, প্রাণ হারায় শিশু, ভিটে-মাটিচ্যুত হয় নরনারী। হিন্দু পাড়ায় আগুন লাগে। সুতারার বাবা সভয়ে আগুন দেখতে যান এবং সমস্ত কিছু উপলব্ধি করে সন্ত্রস্ত হয়ে দরজায় খিল দিয়ে বাড়ির সকলকে থাকতে বলে তমিজ সাহেবের বাড়ি যান। আগুনের লেলিহান শিখা স্পর্শ করে সুতারাদের বাগানবাড়ি-গোয়ালবাড়ি ও বাসগৃহকে। কালো কালো ছায়া এসে জড়ো হয়, করিম-রহিমরা হাসতে থাকে, সুতরার দিদির আর্ত চিৎকার শোনা যায়, মা খিড়কির পুকুরে ঝাঁপ দেন, তাঁর বাবা আর ফিরে আসেন না। এ কেবল সুতরাদের পরিবারের চিত্র নয়, ইতিহাস বলে পূর্ববঙ্গের অসংখ্য হিন্দু পরিবারের উপরই মৌলবাদী মুসলমানেরা স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে হিংস্র গণহত্যা সম্ভ্রমহানি ও ধর্মান্তর ঘটিয়েছিল। সুতরা

সুতারাদের পরিবারের এ দৃশ্য যেন প্রতীকী তাৎপর্য পেয়ে যায়। এই অত্যাচারের তাড়নায় কাতারে-কাতারে হিন্দু শরণার্থীরা মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য হয়, উদভ্রান্ত হয়ে অনিশ্চয়তার জীবন বরণ ক'রে নেয়। সুতরাং নেহেরু জিন্নার মতো নেতারা যতই কেননা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রোধ করার জন্য দেশভাগ অনিবার্য বলে মনে করুন, দেশভাগের কাহিনি দীর্ণতার কাহিনি, রুদ্ধ বেদনার ও নিরুপায় যন্ত্রণার কাহিনি।

কিন্তু জ্যোতির্ময়ীর উপন্যাসের প্রকৃত কাহিনি শুরু এরপর থেকে। দেশভাগের বলি অনিশ্চয়তার অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া নারীর পরিচয় কী? প্রকৃতপক্ষে এইসব নারীরা ইতিহাসে চরম উপেক্ষিত, পরিবার ও রাষ্ট্রও তাদের প্রতি চরম উদাসীন, যা প্রকারান্তরে নিষ্ঠুরতার নামান্তর। 'তমস' ও 'দো গজ জমিন'-এ আমরা দেখেছি পরিবারের সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে নারী কুয়োতে ঝাঁপ দিয়েছে, 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'য় সুতারার মায়ের মতো নারীরা খিড়কি পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, দাঙ্গায় হারিয়ে যাওয়া নারীরা যখন পরিবারে আবার ফিরে এসেছে, তখন সে পায়নি তার পূর্ববর্তী স্থান। পিতৃতন্ত্র নারীর দেহকে কেন্দ্র ক'রে শুচিতার মাপকাঠি স্থির ক'রে দেয় আর তার বিন্দুমাত্র স্খলন ঘটলে অন্য ধরনের মানসিক অত্যাচারের শিকার হয়। এইসব মুহূর্তগুলির যথার্থ আলেখ্য, এইসব নারীদের প্রকৃত জবানবন্দি উন্মোচন করে পিতৃতন্ত্রের ভণ্ডামিকে, বেআব্রু ক'রে সরিয়ে দেয় পরিবার তথা রাষ্ট্রের মুখোশটিকে। 'ইতিহাসে স্ত্রী পর্ব' শুরু তো সেখান থেকেই করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক।

হাড় হিম করা, দানব অত্যাচারের মুহূর্তটিতে জ্ঞান হারানো সুতারাকে রক্ষা করে তার তমিজ কাকা, বাবার কলিগ হেডমাস্টার তমিজ উদ্দিন আহমেদ। তমিজ কাকার স্ত্রী সুতারাকে আপন মেয়ের মতোই সেবা-শুশ্রূষা করেন। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সকলেই মৌলবাদী-হিংস্র কিংবা বর্বর নয়, কেউ কেউ হৃদয়বান-উদার ও মানবিক চেতনাসম্পন্ন বটেন। তাই আত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত তমিজ যখন বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদ করেন তখন হত্যা ও নারী অত্যাচারে পারদর্শী দুঃশাসনেরা বিবেকহীন ভাষণ অবলীলায় দেয়ঃ "তারা বললে, ও সব ধর্ম কথা রেখে দাও। সব দেশেই এ সব আছে হয়। আমরা জানি।" আর তমিজ জানে, যারা এসব কথা বলছিল—"তারা মূর্খ নয়, অশিক্ষিত নয়। আর ধর্ম কর্মও করে। কোরান পড়ে। নামাজ পড়ে। মসজিদে যায়। রোজা রাখে।"

এই সীমাহীন অসহায়-আতঙ্কগ্রস্ত-অবিশ্বাসের কালো মুহূর্তগুলিতে তমিজ সুতারাকে বাড়িতে রেখে স্বাভাবিকভাবেই ভয় পায়। কিন্তু তার পরিবারের আপনজনেরা—তার দাদা, জামাইবাবু, ভাই ও আত্মীয়েরা! পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি তারা! সন্ত্রস্ত মুহূর্তগুলির সাক্ষী বোনকে উদ্ধারে প্রয়াসী হয় না তারা, তার জন্য উদ্বিগ্নও হয় না, বরং সুতারার মতো মেয়ে বেঁচে থাকলে তাদের চিন্তা বহুগুণ বাড়ে, তারা কেমন করে পারিবারিক সম্মান রক্ষা করবে সেইজন্য ফন্দি ফিকির খুঁজে বেড়ায়। একদিকে সুতারা সেই হিংস্র-প্রমত্ত রাত্রির সাক্ষী, সে রাত কেড়ে নিয়েছে তার বাবা-মা ও দিদিকে, কেড়ে নিয়েছে যাবতীয় সম্পত্তি—ভাললাগা ছেলেবেলা, ভালবেসে ফেলা মাতৃভূমি; অন্যদিকে সুতারা আর এক যন্ত্রণার শিকার, সে যন্ত্রণা অব্যক্ত, সুতরাং বুকের মধ্যে জমা হয় চাপা কান্না। তমিজ সাহেব সুতারাকে তার দাদার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে এলে তাঁর সঙ্গে তাঁদের সৌজন্য বিনিময় হয় বটে, কিন্তু বোঝা যায় স্তব্ধ বিমূঢ় দুই সম্প্রদায়ের সহৃদয় মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনার প্রবাহটি রুদ্ধ হয়ে গেছে। সুতারাও উপলব্ধি করে দাদার শ্বশুরবাড়ির লোকজন বিশেষত দাদার

শাশুড়ি ও বয়স্ক নারীরা প্রথা ও সংস্কারবশে তাকে দূরে ঠেলে দেয়। নারী ও পুরুষের পার্থক্য পুরুষতন্ত্র নির্ধারণ করে দেয়, এই তন্ত্রই প্রথা ও সংস্কার সৃষ্টি করে, সেই প্রথা ও সংস্কারের মাধ্যমে এক নারীকে দিয়ে অপর নারীকে লাঞ্ছনা করায়। রামায়ণ-মহাভারতের কাল থেকে লাঞ্ছিত মেয়েদের স্থান হয়নি। অমূল্যবাবুর মতো সেকেলে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট তাই জানেন—বাইরে যে কথা বলা যায় ঘরে সে কথা মানা যায় না। তবুও তাঁর উদারতাতেই সুতারার ঠাঁই হয় বোর্ডিং-এ।

জ্যোতির্ময়ীর 'ইতিহাসে স্ত্রী পর্ব' লেখা হয় সুতারার মতো দেশত্যাগী-বিপর্যস্ত মেয়েকে উপজীব্য ক'রে। কিন্তু এ কাহিনি কেবল নির্দিষ্ট সময়ের আশ্রয়চ্যুত অনাথ মেয়ের ব্যক্তিক কাহিনি নয়। প্রথমত, জ্যোতির্ময়ী অনুষঙ্গ হিসেবে রামায়ণ-মহাভারত পুরাণ উল্লিখনের মধ্য দিয়ে দেখান আজকের সুতারার চাপা কান্না সেকালের নারীর যন্ত্রণাকে যেন ছুঁয়ে যায়। যুগ যুগ ধরে নারী এভাবেই লাঞ্ছিত। দ্বিতীয়ত, কেবল এই ঐতিহাসিক কালগত বিস্তার নয়, ভৌগোলিক স্থানগত বিস্তারের মধ্যেও তিনি স্পর্শ করে যান কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার-পাঞ্জাবের রক্তাক্ত পটভূমিকে। শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের নানা প্রান্তে দাঙ্গা হয়েছে, বিদ্বেষের শিকার হয়েছে নারী, সব প্রান্তেরই যন্ত্রণাদগ্ধ নারীর আর্তিকে তিনি যেন ছুঁয়ে যান। তাই, সুতারা দিল্লিতে পড়ায়, নানা প্রদেশের ছাত্রীকে আপন করে নেয়, কৌশল্যাবতীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে মনের ভার কিছুটা লাঘব করতে পারে। পাঞ্জাবীর মাতাজীকে দেখে ও তার বিষাদময় জীবনকথা শুনে তার মনে হয়—"এ সবই তার জানা কথা। শুধু দেশের আর মানুষের নামগুলিই আলাদা।" সে আরও উপলব্ধি করে : "চিরকালই এই চললো। চলবেও বুঝি অনন্ত কাল ধরে। পুরুষের কাপুরুষ বর্বরতা। পশুরাও যা করে না।" তৃতীয়ত, কেবল ব্যাপক পটভূমির চিত্রণ নয়, সে পটভূমিও যেন প্রতিবেশের মর্যাদা পায়। সুতরাং লাঞ্ছিত নারী কাহিনির অন্তরালে গান্ধি-নেহেরু-জিন্নার প্রসঙ্গও আসে। স্পষ্টত ঔপন্যাসিক দেখান আমাদের স্বাধীনতা লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, অসংখ্য নারীর মান ও ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে এবং ইতিহাসও এ বিষয়ে আশ্চর্যভাবে নীরব। আমাদের দেশভাগ হিংসা- রক্তারক্তি-হানাহানি বন্ধ করার জন্য নয়, তাকে জিইয়ে রাখার জন্য। চতুর্থত, সুতারা ইতিহাসের অধ্যাপিকা। ঔপন্যাসিক সুতারার ইতিহাস পাঠদান—এই প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রথাগত ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ প্রশ্ন বারংবার উথাপন করেন। ইতিহাস লেখার রাজনীতির বিষয়টিতেও তিনি তর্জনী নিক্ষেপ করেন।

জ্যোতির্ময়ীর এ উপন্যাসের সমাপ্তি বিষাদময়তায় নয়, স্বপ্ন সৃজনের মধ্য দিয়ে। সাকিনার দেওয়া প্রস্তাব সুতারা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি, কিন্তু যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম ক'রে প্রমোদ-সুতারা মিলিত হবে—এ ইঙ্গিত উপন্যাসের উপসংহারে মেলে। সুতরাং, দেশভাগ-দাঙ্গার ঐতিহাসিক কাহিনি পরাজয়ের হতে পারে, সুতারার মতো একটি লাঞ্ছিত নারীর কাহিনি সম্ভাবনার কাহিনি। প্রমোদের মতো পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের পক্ষে পূর্ববর্তী প্রজন্মের মনের অন্ধকার দূর করা তথা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব হবে—এ প্রত্যাশাও তো ঔপন্যাসিক জাগিয়ে তোলেন।

দেশভাগের তিনটি উপন্যাসেই আগুন চিত্রকল্প প্রযুক্ত হয়েছে। এ আগুনে যেমন স্বজন স্বভূমি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, এ আগুনে তেমনি সম্প্রদায়গত বিদ্বেষও প্রকাশিত হয়েছে। সর্বোপরি, আগুনের মধ্য দিয়ে কালের সঙ্কটও দ্যোতিত হয়েছে। 'তমস'ও 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'-য় ছায়া প্রসঙ্গটি এসেছে, যা যুগপৎ ষড়যন্ত্র ও বিষাদের প্রতীক বলেই মনে হয়। জ্যোতির্ময়ীর উপন্যাসে সুতারা দেশজননীর প্রতীক আর সামাদের উপন্যাসে বিবিসাহেবা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিভূ

হয়ে ওঠে। তিনটি উপন্যাস প্রসঙ্গেই এ প্রশ্ন মনে জাগে : ঔপন্যাসিক কতটা নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ হতে পেরেছেন? তবে, সামাদ কিংবা সাহানির চেয়ে অনেক বেশি নিরপেক্ষ জ্যোতির্ময়ী।[৫] কেননা তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের যন্ত্রণাকেই কেবল নয়, নারীর যন্ত্রণার কথাই বলেন আর যে না জানে দেশভাগের দিনগুলিতে অত্যাচারীর ভূমিকা পালন করেছে প্রত্যক্ষভাবে প্রধানত পুরুষই।

তবে একটা জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। হামিদ নেপাল হয়ে পাকিস্থান এবং সেখান থেকে আরবে পৌঁছায়। সুতারা শত লাঞ্ছিত হয়েও কলেজের অধ্যাপিকারূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে অসংখ্য হামিদ হতাশায় গ্রস্ত হয়, অজস্র সুতারা থেকে যায় পরিচয়হীন, ভাষাহীন, মূক, অবিরত যন্ত্রণায় দগ্ধ। জ্যোতির্ময়ীর 'ছেলেটা' গল্পের সেই মায়ের কথাই বলা যায়। উপমহাদেশ কি তাদের উপেক্ষার হাত থেকে মুক্ত করতে পারবে? ইতিহাস কি তাদের কথা বলবে? এখানেই বোধ হয় সাহিত্য আর ইতিহাসের বড় পার্থক্য। সাহিত্য বাস্তবের প্রতিলিপি নয়, তাই সাহিত্যে আধিপত্যকারীর প্রতাপকে দেখিয়ে ও তার দৃষ্টি এড়িয়ে বা উপেক্ষা ক'রে আধিপত্যাধীনের যন্ত্রণার কথা বলা যায়। তবে আশার কথা, সেই সব হারিয়ে যাওয়া নারীদের জবানবন্দি, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র সংগ্রহ ক'রে অন্য এক ইতিহাস লিখতে প্রয়াসী হয়েছেন একালের নারীরা। প্রসঙ্গত উর্বশী বুটালিয়ার 'দ্য আদার সাইড অফ সাইলেন্স', রীতু মেনন ও কমলা ভাসিনের 'বর্ডার অ্যান্ড বাওন্ডারিজ' এবং বীণা দাসের 'ন্যাশনাল অনার অ্যান্ড প্র্যাকটিকাল কিনস্‌শিপ : অফ আনওয়ান্টেড উওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন'—এই গ্রন্থত্রয়ীর নাম বলা যেতে পারে।[৬]

উল্লেখপঞ্জি

১। ৮.৩.১৯৬৩ তারিখে 'ফসল' পত্রিকার সম্পাদকের মাধ্যমে নিতাই বসুকে একথা লিখেছিলেন সুবোধ ঘোষ। অরিন্দম চক্রবর্তী : 'সুবোধ ঘোষ : কথাসাহিত্য', পুস্তক বিপণি, ২০০১, পৃষ্ঠা ২৮৫।

২। 'তমস' উপন্যাস সংক্রান্ত উদ্ধৃতিগুলি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত ও সাক্ষরতা প্রকাশন প্রকাশিত 'ভীষ্ম সাহানী তমস' (১৩৯৫) গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

৩। 'আদার সাইড অফ সাইলেন্স' গ্রন্থে উর্বশী বুটালিয়া তাঁর রাণামামার কথা বলেছেন। ধর্মান্তরিত হয়ে পাকিস্তানে চল্লিশ বছর ধরে অনিদ্রার জীবন কাটাচ্ছেন—একথা তিনি উর্বশীকে জানিয়েছিলেন।

৪। 'দো গজ জমিন' উপন্যাসটি অনুবাদ করেছেন 'সাড়ে তিন হাত ভূমি' নামে আফসার আমেদ ও কলিম হাজিক। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাস-সংক্রান্ত উদ্ধৃতিগুলি সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে।

৫। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিটি কতটা অসার তা কেবল ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্থানে প্রমাণিত হয়নি, ভারতেও প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৮৪-এর দাঙ্গা ঋতু মেননের ইতিহাস সম্পর্কিত বোধকেই পাল্টে দিয়েছে—

"1984 changed all that. The ferocity with which Sikhas were killed in cit after city in north India in the wake of Indira Gandhi's assassination, th confusion and shock that stunned us into disbelief and then into a terribl realization of what had happend, dispelled forever that false sense

security. .....But here was partition once more in our midst, terrifying for those who had passed through it in 1947.....Yet this was our own country, our own people, our own home-grown violence. Who could we blame now?"

Ritu Menon & Kamala Bhasin : 'Borders & Boundaries : Women in India's Partition', Kali for Women, 1998 (First Published), 2007 (Repriented), Preface, xi.

৬। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাস সংক্রান্ত উদ্ধৃতিগুলি সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদিত) : 'জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন', দেজ পাবলিশিং, ১৩৯৮ (প্রথম প্রকাশ), ১৪০৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

৭। নিয়াজ জামান বলেছেন :

"Tamas is not completely unbiased. Though Tamas does show communalities and fundamentalists on all sides there is a defference."

একথা বলার পর তিনি রণবীর, মুরাদ আলি ও শাহনাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্যের প্রতিযুক্তিও দেওয়া যায়। অবশ্য তিনি একথা বলেছেন : "Nevertheless, the most dramatic and heroic moment of the book—and the mini series—is the scene of the Sikh women jumping into the well to save themselves. This act of courage, this act of honour, is superior to any heroic act performed by the other community.

Niaz Zaman : 'A Divided Legacy', Manohar, 2000, Page 187-188.

৮। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখা ছেচল্লিশের দাঙ্গা', 'দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা' ও 'দেশভাগ দেশত্যাগ'; অশোকা গুপ্তের 'নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে', প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তীর 'দ্য মার্জিনাল সেন' ও 'প্রান্তিক মানব পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা', সুরঞ্জন দাসের 'কমিউন্যাল রায়টস ইন বেঙ্গল ১৯০৫—১৯৪৭' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।